সাধনা পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

লেখকের কথা

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মের ইতিহাসে সাময়িক পত্রের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর সমগ্র রচনাসাহিত্যের প্রায় সবটাই প্রথমে সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ও পরে সে-সব রচনা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও রচনাবলীতে সংকলিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রায় সব বইয়ের সব লেখাই সাময়িকপত্র থেকে গ্রন্থে সংকলনকালে পাঠ সংশোধন সংযোজন পরিবর্তন পরিমার্জন করেছেন। কবি সর্বদাই তাঁর পূর্বপাঠ পুনর্মুদ্রণকালে শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর করে তুলতে চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর সব পাণ্ডুলিপি তো আর পাওয়া যায় না; আর যা পাওয়া যায় তাও সংগ্রহশালার শীতল কক্ষে সংরক্ষিত। সকলের সহজে দেখার সুযোগের সীমানার বাইরে। সুতরাং পাণ্ডুলিপির পরে তাঁর মুদ্রিত আদিপাঠের প্রতি যদি কৌতূহলী হতে হয় তবে পুরাতন সাময়িকপত্রের পাতার মধ্যে আমাদের প্রবেশ করতেই হবে। মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথকে ভালো করে জানতে বুঝতে, তাঁকে ধারাবাহিকভাবে অনুধাবন করতে, তাঁর বইয়ের প্রথম সংস্করণের চেয়ে তারও পূর্ববর্তী সাময়িকপত্রে মুদ্রিত পাঠের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমাদের পক্ষে খুবই জরুরী দরকার। সাময়িকপত্রে বছরে-বছরে প্রতি মাসে প্রতি সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথ একটি একটি করে কী কী লেখা ক্রমান্বয়ে লিখে গেছেন তার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস জানা আমাদের খুবই প্রয়োজন। জানতে চাই কোন্ মাসে কোন্ উপন্যাসের কোন্ পরিচ্ছেদ, কোন্ গল্প, কোন্ প্রবন্ধ, কোন্-কোন্ কবিতা বা গান, বা কোন্ নাটক-নাটিকা প্রকাশিত হয়েছিল কোন্ পত্রিকায় বা কোন্ কোন্ পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যচর্চায় এই জিজ্ঞাসা মেটাতে প্রয়োজন একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা যেখানে থাকবে রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনে সাময়িকপত্রে মুদ্রিত রচনার কালানুক্রমিক একটি সূচি। এমন পূর্ণাঙ্গ একটি সূচি আজও পর্যন্ত প্রস্তুত করা হয়ে ওঠে নি। আমরা এই বইতে ১২৮১ থেকে ১৩০২ পর্যন্ত সময়পর্বে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার একটি বিস্তৃত কালানুক্রমিক সূচি নির্মাণ করে দিয়েছি। ১৩০২ কার্তিকের পর সাধনা পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। আর সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় ১২৮১ অগ্রহায়ণে তত্ত্ববোধিনীতে। সাময়িকপত্রে রবীন্দ্ররচনা প্রকাশের প্রথম বাইশ বছরের সূচি প্রস্তুত করা হয়েছে এই বইতে। দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৩০২ অগ্রহায়ণ থেকে ১৩৪৮—এই পরবর্তী ছেচল্লিশ বছরের কোনও সূচি আজও পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর

সত্তর বছর পরেও এমন কাজ এখনও হল না। ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে 'রবীন্দ্রনাথ: সাধনা ও সাহিত্য' নামে যে বই প্রকাশিত হয়েছিল, তিরিশ বছর পর নতুন করে তারই পরিবর্তিত পরিমার্জিত সংস্করণ এই বই। আগের বইতে সাধনার থেকে উদ্ধার করা রবীন্দ্রনাথের বহু অনাবিষ্কৃত লেখা সংগ্রহ করা হয়েছিল। সে সব রচনা একালে রবীন্দ্র-রচনাবলীতে সংকলিত হওয়ায় আমার বই থেকে এখন তা পরিত্যাগ করা গেল। পুরাতন অধ্যায় বর্জন নতুন অধ্যায় সংযোজন ইত্যাদি কাজ বই জুড়ে করা হয়েছে। বইটি আলাদা চেহারা নেওয়ায় বইয়ের নামেও পরিবর্তন ঘটল। কিছু দিন আগে 'বঙ্গদর্শন পত্রিকা ও বঙ্কিমচন্দ্র' শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করেছি; সেই নামের অনুসরণেই এই বইয়ের নাম হল 'সাধনা পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ'। ইচ্ছে রইল আর একটি বই করার—'সংবাদ প্রভাকর ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত'। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে মোট পাঁচটি পত্রিকা সম্পাদনা করলেও সাধনাই ছিল একান্তভাবে তাঁর নিজের কাগজ তাঁর প্রিয় পত্রিকা তাঁর 'হাতের কুঠার'। বলেছেন, 'সাধনা আমার হাতের কুঠারের মতো,... এ'কে আমি ফেলে রেখে মর্‌চে পড়তে দেব না—এ'কে আমি বরাবর হাতে রেখে দেব। যদি আমি আরও আমার সহায়কারী পাই তো ভালোই, না পাই তো কাজেই আমাকে একলা খাটতে হবে।' সাধনা মোট চার বছর চলেছিল। প্রথম তিন বছর কবি নিজের নাম না ছাপিয়ে সম্পাদকরূপে ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথের নাম ছাপিয়ে-ছিলেন; শেষ বছর সম্পাদকরূপে নিজের নামই প্রকাশ করেন। এই চারটি বছর ছিল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সাধনার যুগ—শুধু তাই নয়, এটিই প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রসাহিত্যের স্বর্ণযুগ। রচনার এমন প্রাচুর্য এই সময়ে যা ঘটেছে এমন আর কখনো ঘটে নি। সারা জীবনে যত ছোটোগল্প লিখেছেন এই চার বছরের মধ্যে তার প্রায় অর্ধেক লিখে ফেলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গল্পে কবিতায় প্রবন্ধে সমালোচনায় ডায়রিতে পঞ্চভূতে কথা ও কাহিনীতে গানে রবীন্দ্রনাথ এই সময় সত্যিই বুঝি ছিলেন সব্যসাচী। এই সময় পর্বে মাসিক সাধনা পত্রিকার পাতা উলটে উলটে রবীন্দ্রনাথকে যদি খুঁজি তাহলে সত্যিই বুঝি এক অনন্য রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করা যাবে—যা তাঁর পৃথক পৃথক বই অবলম্বনে ততটা সম্ভব নয়। এই বইয়ের পরিশিষ্টে শুধু সাধনা নয়, রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সব কয়টি পত্রিকার প্রতি মাসের সূচি প্রস্তুত করে দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সব কয়টি পত্রিকার সূচি এই প্রথম একত্রে সংকলিত হল। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সূচি নির্মাণে শ্রীপ্রত্যূষকুমার রীতের কাছে আমি উপকৃত হয়েছি। বইটি যত্ন সহকারে প্রকাশ করলেন পুনশ্চ প্রকাশনার শ্রীসন্দীপ নায়ক। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও প্রীতি জানাই।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা ১৩

প্রথম অধ্যায়

সাধনা কার্যত প্রথমাবধি রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ সাধনা পর্বে রবীন্দ্রজীবনের রেখাচিত্র ২৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ সাধনা সম্পাদনকর্মে রবীন্দ্রমানস ৩৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ ছিন্নপত্রাবলীতে সাধনা প্রসঙ্গ ৪১

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ সাধনা পত্রিকা : বহিরঙ্গ পরিচয় ৫০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ সমকালীন পত্র-পত্রিকায় সাধনা প্রসঙ্গ ৫৮

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাময়িকপত্র ৬৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার কালানুক্রমিক সূচি : আদি থেকে সাধনা পর্ব ৭৫

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্র-কবিতা ১০১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ রবীন্দ্রকাব্যে পাঠভেদ : সাধনার মূলপাঠ ১৪৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ১৫৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পাঠভেদ : সাধনার মূলপাঠ ১৬৬

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-নিবন্ধ : সাধনার প্রথম বর্ষ ১৭১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-নিবন্ধ : সাধনার দ্বিতীয় বর্ষ ১৮৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-নিবন্ধ : সাধনার তৃতীয় বর্ষ ২০০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-নিবন্ধ : সাধনার চতুর্থ বর্ষ ২১৭

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ সাধনার লেখকগোষ্ঠী ২২৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ সাময়িকপত্রে সাধনার লেখকগোষ্ঠীর রচনার সমালোচনা ২৩৫

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত পত্রপত্রিকার প্রতি সংখ্যার সূচি

ক. সাধনা ১২৯৮ - ১৩০২ ২৫১
খ. ভারতী ১৩০৫ ২৬৩
গ. নবপর্যায় বঙ্গদর্শন ১৩০৮ - ১৩১২ ২৬৬
ঘ. ভাণ্ডার ১৩১২ - ১৩১৪ ২৮২
ঙ. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৩১৮ - ১৩২১ ২৮৭

'যখন মন একটু খারাপ থাকে তখনই সাধনাটা অত্যন্ত ভারের মতো বোধ হয়। মন ভালো থাকলে মনে হয়, সমস্ত ভার আমি একলা বহন করতে পারি। তখন মনে হয়, আমি দেশের কাজ করব এবং কৃতকার্য হব। তখন লোকের উৎসাহ এবং অবস্থার অনুকূলতা কিছুই আবশ্যক মনে হয় না, মনে হয় আমার নিজের কাজের পক্ষে আমি নিজেই যথেষ্ট। তখন এক-এক সময়ে আমি নিজেই খুব দূর ভবিষ্যতের যেন ছবি দেখতে পাই—আমি দেখতে পাই, আমি বৃদ্ধ পক্ককেশ হয়ে গেছি, একটি বৃহৎ বিশৃঙ্খল অরণ্যের প্রায় শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁচেছি, অরণ্যের মাঝখান দিয়ে বরাবর সুদীর্ঘ একটি পথ কেটে দিয়ে গেছি এবং অরণ্যের অন্য প্রান্তে আমার পরবর্তী পথিকেরা সেই পথের মুখে কেউ কেউ প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে, গোধূলির আলোকে দুই-এক জনকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। আমি নিশ্চয় জানি 'আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে'। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে আমি দেশের মন হরণ করে আনব—নিদেন আমার দু-চারটি কথা তার অন্তরে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকবে। এই কথা যখন মনে আসে তখন আবার সাধনার প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়ে ওঠে। তখন মনে হয় সাধনা আমার হাতে কুঠারের মতো, আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করবার জন্যে এ'কে আমি ফেলে রেখে মর্‌চে পড়তে দেব না—এ'কে আমি বরাবর হাতে রেখে দেব। যদি আমি আরও আমার সহায়কারী পাই তো ভালোই, না পাই তো কাজেই আমাকে একলা খাটতে হবে।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপক্রমণিকা

"আমি নিশ্চয় জানি 'আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে'।"
('আমার কামনা কভু না নিষ্ফল হবে' : চিত্রাঙ্গদা, প্রথম সংস্করণ)

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবনে গদ্যে-পদ্যে সাহিত্যের যে বিপুল সম্ভার উপহার দিয়ে গিয়েছেন তার প্রায় নব্বই শতাংশ রচনাই প্রথমে সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়, পরে সে-লেখা তাঁর পুস্তকের অন্তর্গত হয়ে প্রকাশিত হয়। সাময়িকপত্রকে বঞ্চিত করে সরাসরি গ্রন্থাকারে ছাপা হয়েছে— রবীন্দ্রনাথের এমন রচনার পরিমাণ অতিশয় সামান্য।

বাংলা সাময়িকপত্র যে শুধু রবীন্দ্রসাহিত্য প্রকাশ করেই তার দায়িত্ব পালন করেছে তা নয়, কোনো কোনো পত্র-পত্রিকা কবির নিকট সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা হয়েও দেখা দিয়েছিল প্রত্যক্ষভাবে।

সুবিখ্যাত পত্রিকা বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব না ঘটলে বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যসম্রাট রূপে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যেত কি না সে-কথা আজ বলা কঠিন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী লিখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি, প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকার, সৃষ্টি হল বঙ্গদর্শন, একাধারে সম্পাদক ও লেখকরূপে আবির্ভূত হলেন সব্যসাচী বঙ্কিমচন্দ্র। যিনি ছিলেন শুধু ঔপন্যাসিক—তিনি কবি ঔপন্যাসিক প্রাবন্ধিক দার্শনিক সমালোচক ও সম্পাদক রূপে আবির্ভূত হলেন বঙ্গদর্শনের পাতায়। আপন সৃষ্ট সাহিত্যের যোগ্য প্রকাশভূমি নিজেই প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথকেও রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজনে সৃষ্টি করতে হয়েছিল একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা, যে-পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে নিজের আদর্শে ও পরিকল্পনায় পরিচালিত হবে এবং যে পত্রিকায় নিজের রচনা অপর্যাপ্ত প্রকাশ করায় থাকবে না কোনো বাধা এবং কুণ্ঠা। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়োজন হয়েছিল বঙ্গদর্শনের, রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন হল মাসিক সাধনা পত্রিকার। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবনে অনেকগুলি পত্রপত্রিকা সম্পাদন করেছিলেন— সাধনা তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম। ভারতী যদিও ঘরের পত্রিকা, তবুও তো ঠিক একান্ত নিজের পত্রিকা নয়। সম্পাদিকার হাতে নিজের লেখা বেশি মাত্রায় ঘন ঘন তুলে দেওয়া হয়তো কবির পক্ষে একান্ত সংকোচের কারণ হয়েছিল, হিতবাদী পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মিল হল না ; এ অবস্থায় প্রয়োজন হল একেবারেই নিজের মনের মতন একটি পত্রিকা— যে পত্রিকার প্রধানতম লেখক হবেন অকুণ্ঠিত রবীন্দ্রনাথ— যিনি 'প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে' অপারগ।

সাধনা পত্রিকা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখনীধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। মাসে মাসে একটি লেখনী মুখ থেকে একই সঙ্গে নির্ঝরিত হল কাব্য-কবিতা, ছোটোগল্প, সাহিত্য-

প্রবন্ধ, শব্দতত্ত্ব, সমালোচনা, ভ্রমণবৃত্তান্ত, সংলাপধর্মী অভিনব রচনা, ব্যঙ্গকৌতুক, বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা, রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক আলোচনা এবং পত্রিকার নিয়মিত বিভাগগুলির চিত্তাকর্ষক মূল্যবান নিবন্ধাদি।

সমগ্র জীবনে রবীন্দ্রনাথ যতগুলি ছোটোগল্প লিখেছিলেন তার প্রায় অর্ধাংশই রচিত হয়েছিল চার বৎসরের সাধনা পত্রিকার পাতায়।

সাধনা পত্রিকার যুগে রবীন্দ্রনাথ নিজে সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কারের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়-পর্বে কখনো তাঁর মনে হয়েছে কাব্য রচনাতেই তাঁর সবটুকু সুখ, কখনো বোধ হয়েছে ছোটো ছোটো গল্প লেখাতেই তাঁর সৃষ্টির সার্থকতা, আবার কখনো বা অনুভব করেছেন সাধনায় উচ্চ বিষয়ের প্রবন্ধ লিখে বঙ্গদেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়াই হল মহৎ কাজ।

একজন লেখককে সাময়িকপত্রের লেখাগুলির মধ্য থেকে যেভাবে আবিষ্কার করা যায়, পরবর্তী কালে মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর মধ্য থেকে তাঁকে সেভাবে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব বলে মনে হয় না। একটি লেখা সাময়িকপত্রে লেখক যখন লেখেন এবং সেই রচনাটি যখন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়—এই দুইয়ের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময়ের অনেক ব্যবধান ঘটে যায়। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনাই সাময়িকপত্রে প্রকাশের এক বা দুই দশক পরে গ্রন্থের অন্তর্গত হয়েছে। আবার এমন বিপুল সংখ্যক রচনা আছে যা সাময়িকপত্রে প্রকাশের পর আজও গ্রন্থভুক্ত হয় নি, এবং সংকলিত হয়নি অদ্যাবধি রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনাবলীতেও। পুরাতন সাধনা পত্রিকার পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের বহু মূল্যবান বিবিধ বিষয়ক নানান রচনা—যার অস্তিত্ব পর্যন্ত আমাদের নিকট প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত ওই বিলুপ্ত প্রায় রচনাবলীর মধ্য থেকে রবীন্দ্রনাথকে নূতন করে আবিষ্কার করার অবকাশ ঘটে।

সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনা পরবর্তী কালে গল্পগুচ্ছ, সোনার তরী, চিত্রা, কথা ও কাহিনী, আধুনিক সাহিত্য, লোকসাহিত্য, সাহিত্য, শব্দতত্ত্ব, সমাজ, রাজাপ্রজা, শিক্ষা, পঞ্চভূত, ব্যঙ্গকৌতুক, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি প্রভৃতি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ-ছাড়া যে রচনাগুলি অদ্যাবধি গ্রন্থভুক্ত হয়নি, সেগুলিও নানা দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান।

রবীন্দ্রনাথ সাধনার জন্য যে-কোনো সাধারণ একটি লেখাও অতিশয় যত্ন সহকারে রচনা করতেন। সাধনার বেদিমূলে প্রতিষ্ঠিত তাঁর সরস্বতীকে কবি কোনো অবস্থাতেই অবহেলা করতে পারেননি। অথচ 'যথাসাধ্য এবং যথাসম্ভব যত্নে' রচিত তাঁর সব কয়টি রচনা সাধনা পত্রিকা থেকে এতাবৎকাল আমরা সংগ্রহ পর্যন্ত করতে উদ্যোগী হইনি।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।"

কবিকে যদি সত্যই গভীরভাবে বুঝতে চাই তবে পুরাতন সাময়িকপত্র-পত্রিকার ফাইলের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করতেই হবে। তাঁর রচিত সাহিত্য বা আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থে হয়তো সাহিত্যবিষয়ক রচনাগুলি একত্রে পাওয়া গেল, সমাজ গ্রন্থে সমাজবিষয়ক লেখাগুলি একসঙ্গে পাঠ করার সুযোগ হল, গল্পগুচ্ছে সাধনার গল্পগুলি পড়লাম, সোনার তরীতে পেলাম সাধনার যুগে প্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ। আমরা বইগুলি পাঠ করে বলতে পারি গল্পগুচ্ছে সাধনার যুগের ৩৬টি গল্প আছে, কিংবা বলতে পারি তাঁর সোনার তরী কাব্যগ্রন্থ সাধনা পত্রিকার যুগে রচিত। কিন্তু মন যদি প্রশ্ন করে, যে-মাসে কবি সোনার তরীর রাজার ছেলে বা রাজার মেয়ে

লিখেছিলেন সেই মাসে তিনি অন্যান্য রচনা আর কী কী লিখেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে পুরাতন পত্র-পত্রিকার ফাইলের শরণাপন্ন হতেই হবে।

রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে সাধনা পত্রিকায় ১২৯৯ আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সে -মাসে পত্রিকায় ছাপা হয় গল্পগুচ্ছের একটা আষাঢ়ে গল্প, পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কবির লেখা চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব, য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারির লন্ডনে, সাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্গত সাহিত্যের প্রাণ, সমাজ গ্রন্থের অন্তর্গত আদিম সম্বল এবং শব্দতত্ত্ব গ্রন্থের অন্তর্গত স্বরবর্ণ শীর্ষক রচনা। অর্থাৎ একজন লেখক একটি সময়ে কী কী রচনা লিখেছিলেন, তাঁর চিন্তা-ভাবনার প্রবাহটি তৎকালে কী-প্রকার ছিল—এ-বিষয়ে স্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যাবে, যদি আমরা মূল পত্রিকা অবলম্বনে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠের অবকাশ পাই। সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলি সাময়িকপত্রে প্রকাশের কাল অনুসারে যদি কোনোদিন সংকলন ও প্রকাশ করা যায় তবে রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের নিকট আরও স্পষ্ট প্রত্যক্ষ এবং জীবন্ত হয়ে উঠবেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই পদ্ধতিতে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলি সত্যই কোনোদিন প্রকাশ করা সম্ভব হবে কি না জানি না ; কিন্তু এই প্রণালীতে রবীন্দ্রনাথকে নূতন করে অনুসন্ধানের যে প্রয়োজন আছে তা সকলেই স্বীকার করবেন। এই কাজে আমাদের প্রথম করণীয় হল সাময়িকপত্রে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার কালানুক্রমিক সূচি প্রস্তুত করা । এই সূচিই হবে প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথকে অনুসন্ধানের প্রধানতম সরণি। বর্তমান গ্রন্থে আমরা সাময়িকপত্রে রবীন্দ্ররচনা প্রকাশের সূচনা থেকে সাধনার শেষ সংখ্যা অর্থাৎ ১৩০২ কার্তিক পর্যন্ত সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনার কালানুক্রমিক সূচি যথাসাধ্য প্রস্তুত করেছি।

পূর্বেই বলেছি, সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ শুধু লেখকমাত্রই ছিলেন না, এই পত্রিকা সম্পাদনার সকল দায়িত্ব তাঁর উপরেই ছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাময়িকপত্রের সম্পাদকরূপেও তাঁর ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এই কর্মে তাঁর চোখের সামনে যিনি আদর্শরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র। সাধনায় বঙ্কিমচন্দ্রকে দিয়েও লেখাবেন স্থির করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—বঙ্কিমচন্দ্র কবিকে সম্মতিও জানিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর ঘটে ওঠেনি। এই পত্রিকাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের পর শোক প্রস্তাব রচনা করতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকেই।

বাল্যকাল থেকেই বাংলা সাময়িকপত্র-পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ঘটে। বঙ্গদর্শন ও তার পূর্ববর্তী কয়েকটি পত্র-পত্রিকার কথা কবি নিজেই লিখে গিয়েছেন জীবনস্মৃতির ঘরের পড়া অধ্যায়ে।

"রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিবিধার্থ-সংগ্রহ বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিক পত্র বাহির করিতেন। তাহারই বাঁধানো একভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বার বার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকো বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোশের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমিমৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।

এই ধরনের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন। একদিকে বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান পুরাতত্ত্ব অন্যদিকে প্রচুর গল্প কবিতা ও তুচ্ছ ভ্রমণকাহিনী দিয়া এখনকার কাগজ ভরতি করা হয়।

সর্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না। বিলাতে চেম্বার্স জার্নাল, কাস্‌ল্‌স্‌ ম্যাগাজিন, স্ট্রাণ্ড্‌ ম্যাগাজিন প্রভৃতি অধিক সংখ্যক পত্রই সর্বসাধারণের সেবায় নিযুক্ত। তাহারা জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সমস্ত দেশকে নিয়মিত মোটা ভাত মোটা কাপড় জোগাইতেছে। এই মোটা ভাত মোটা কাপড়ই বেশির ভাগ লোকের বেশি মাত্রায় কাজে লাগে।

বাল্যকালে আর একটি ছোটো কাগজের পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম। তাহার নাম অবোধবন্ধু। ইহার আবাঁধা খণ্ডগুলি বড়দাদার আলমারি হইতে বাহির করিয়া তাঁহারই দক্ষিণদিকের ঘরে খোলা দরজার কাছে বসিয়া বসিয়া কতদিন পড়িয়াছি।...

অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরও বেশি দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, এখন যে-খুশি সেই অনায়াসে একেবারে এক গ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া—তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর কেহ পাইবে না।"

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশিত হয় ১৮৫১ অক্টোবর মাসে। বিবিধার্থ সংগ্রহ ও সাধনা পত্রিকার মধ্যবর্তী উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পত্র-পত্রিকা হল : পত্রিকা ১৮৫৪ (প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার), সোমপ্রকাশ ১৮৫৮ (দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ), ঢাকাপ্রকাশ ১৮৬১ (কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার), রহস্য-সন্দর্ভ ১৮৬৩ (রাজেন্দ্রলাল মিত্র), গ্রামবার্তা-প্রকাশিকা ১৮৬৩ (হরিনাথ মজুমদার), অবোধবন্ধু ১৮৬৩ (যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ), অমৃতবাজার পত্রিকা ১৮৬৮ (শিশিরকুমার ঘোষ), বঙ্গদর্শন ১৮৭২ (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), জ্ঞানাঙ্কুর ১৮৭২ (কৃষ্ণ দাস), সাধারণী ১৮৭৩ (অক্ষয়চন্দ্র সরকার), ভ্রমর ১৮৭৪ (সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), আর্যদর্শন ১৮৭৪ (যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ), বান্ধব ১৮৭৪ (কালীপ্রসন্ন ঘোষ), প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ১৮৭৪ (সারদাচরণ মিত্র), প্রতিবিম্ব ১৮৭৫ (রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ), ভারতী ১৮৭৭ (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর), বঙ্গবাণী ১৮৮১ (জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়), সখা ১৮৮৩ (প্রমদাচরণ সেন), সঞ্জীবনী ১৮৮৩ (দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়), নব্যভারত ১৮৮৩ (দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী), নবজীবন ১৮৮৪ (অক্ষয়চন্দ্র সরকার), প্রচার ১৮৮৪ (রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), বালক ১৮৮৫ (জ্ঞানদানন্দিনী দেবী), সাহিত্য ১৮৯০ (সুরেশচন্দ্র সমাজপতি), হিতবাদী ১৮৯১ (কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য)।

সাধনা-পূর্ববর্তী হিতবাদী পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যেমন কয়েকটি উচ্চাঙ্গের সাময়িক পত্র দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, তেমনি তিনি চোখের সামনে ছোটোখাটো নিম্নমানের পত্রিকাও নিশ্চয় অনেক দেখেছিলেন। তাদের কথা স্বতন্ত্রভাবে তিনি কোথাও না বলে গেলেও হিতবাদীতে প্রকাশিত তারাপ্রসন্নের কীর্তি গল্পে কল্পিত অনেকগুলি পত্রিকার নাম (গৌড়বার্তাবহ, নবপ্রভাত, ভারতভাগ্যচক্র, শুভজাগরণ, অরুণালোক, সংবাদতরঙ্গভঙ্গ, আশা, আগমনী, উচ্ছ্বাস, পুষ্পমঞ্জরী, সহচরী, সীতা-গেজেট, অহল্যালাইব্রেরী-প্রকাশিকা, ললিত সমাচার, কোটাল, বিশ্ববিচারক ইত্যাদি) উল্লেখ করে যেন তাদেরই প্রতি ইঙ্গিত করে গিয়েছেন।

আমরা সাধারণত বইয়ের প্রথম সংস্করণের পাঠের সঙ্গে শেষ সংস্করণ মিলিয়ে পাঠভেদ নির্ণয় করি। কিন্তু যে-রচনা সাময়িকপত্রে প্রকাশের পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল—সে রচনার

সাময়িকপত্রের পাঠকেই প্রথম মুদ্রিত পাঠ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বইয়ে সাময়িকপত্রে মুদ্রিত পাঠ যথেষ্ট পরিবর্তন করেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠভেদ বিচারে পুরাতন পত্র-পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ এবং প্রবণতা কী প্রকার ছিল, তাঁর পত্রিকার সঙ্গে সমকালীন অপর কোন্ কোন্ লেখক যুক্ত ছিলেন, তাঁরা পত্রিকায় কী কী বিষয়ে লিখেছিলেন—সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথকে জানতে গেলে এই সকল তথ্যের সঙ্গেও আমাদের যুক্ত হওয়া দরকার। সমকাল রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে বিচার করেছিলেন তাও আমাদের জানতে হবে। আরও জানা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথই বা মাসে মাসে নিজের পত্রিকায় সমকালীন অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহের কীপ্রকার সমালোচনা করেছিলেন? সুবিখ্যাত সাহিত্যপত্র সাধনাকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের 'কবিত্ব' অপেক্ষা 'কবি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই বুঝতে চেষ্টা করেছি।

প্র থ ম অ ধ্যা য়

সাধনা কার্যত প্রথমাবধি রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত

"চিরজীবন সাধনার এডিটরি করে কাটিয়ে দেব।"

১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস থেকে (ডিসেম্বর ১৮৯১) সাধনা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির আয়ুষ্কাল চার বৎসর। প্রথম তিন বৎসর সম্পাদক হিসাবে নাম ছিল রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র সুধীন্দ্রনাথের। চতুর্থ বৎসর রবীন্দ্রনাথ স্বনামে সম্পাদক হিসাবে আবির্ভূত হন।

সাধনা প্রকাশের পূর্বে ওই বৎসরের গোড়ায় (১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮, ৩০ মে ১৮৯১) সাপ্তাহিক পত্র হিতবাদীর জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথ ওই পত্রিকার সাহিত্যশাখার সম্পাদক হন। মূল সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে পত্রে লিখছেন, "কৃষ্ণকমলবাবুকে প্রধান সম্পাদক, আমাকে সাহিত্যবিভাগের সম্পাদক এবং মোহিনীকে [চট্টোপাধ্যায়] রাজনৈতিক সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে। বঙ্কিম, রমেশ দত্ত প্রভৃতি অনেক ভালো ভালো লোক লেখায় যোগ দিতে রাজি হয়েছেন। যাই হোক্, ইতিমধ্যে দু'তিন মাসের লেখা আমার হাতে জড় না হলে আমাকে ভারি মুস্কিলে পড়তে হবে। আবার, কথা হয়েছে প্রতি সংখ্যায় একটা করে ছোট গল্প থাকবে। তোমাকে এই সংকটের সময় আমার সহযোগিতা করতে হচ্ছে। গুটিকতক বেশ ছোট ছোট লঘু পাঠ্য সাহিত্য প্রবন্ধ পাঠাতে হচ্ছে। যত ছোট হয় তত ভালো অতএব সময়াভাবের ওজর ঠিক খাটবে না। বালকে তুমি যেমন বসন্ত উৎসব পাঠশালা প্রভৃতি পাড়াগাঁয়ের চিত্র দিয়েছিলে সেগুলি বড় ভালো জিনিস হয়েছিল কিন্তু আমি তোমাকে ফরমাস করতে চাইনে। তুমি তোমার কর্মস্থানেরও চিত্র দিতে পার কিংবা যা ইচ্ছা লিখতে পার। এই প্রসঙ্গে আর একটা খবর দেওয়া আবশ্যক— লেখকেরা কাগজের অংশ থেকে কিছু পরিমাণে পারিতোষিক পাবেন।— যাই হোক্ লেখা আমাকে যত শীঘ্র সম্ভব পাঠাবে।"[১]

এই হিতবাদী পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক মাস তিনেকের বেশি ছিল না।[২] পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্রে কবি জানিয়েছেন, "সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়।...সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটগল্প সমালোচনা ও সাহিত্য-প্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটগল্প লেখার সূত্রপাত ওইখানেই, ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।"[৩]

---

১. বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৯।

২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়— রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ড।

৩. আত্মপরিচয়, পরিশিষ্ট।

হিতবাদী প্রকাশকালের ছয় মাসের মধ্যে সাধনা প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথ পদ্মিনীমোহনকে লিখেছেন, "সাধনা পত্রিকার অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরি পরিমাণে ছিল।"

আমাদের বক্তব্য প্রথম তিন বৎসরের পত্রিকায় সম্পাদক হিসাবে সুধীন্দ্রনাথের নাম মুদ্রিত হলেও সাধনার মুখ্য পরিচালক বা সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। পত্রিকার প্রচ্ছদে সম্পাদক হিসাবে যখন সুধীন্দ্রনাথের নাম ছাপা হচ্ছে সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার সাধনা পত্রিকাটিকে 'আমার সাধনা' বলে ঘোষণা করেছেন। একটি পত্রে[৪] সাধনা প্রসঙ্গে বলছেন, "আমি নিশ্চয় জানি 'আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে'।" ওই পত্রেই পরে লিখেছেন, "সাধনা আমার হাতের কুঠারের মতো, আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করবার জন্যে এ'কে আমি ফেলে রেখে মর্‌চে পড়তে দেব না— এ'কে আমি বরাবর হাতে রেখে দেব। যদি আমি আরও আমার সহায়কারী পাই তো ভালোই, না পাই তো কাজেই আমাকে একলা খাটতে হবে।"— এ কার কথা? শুধু কি একজন লেখকমাত্রের? না কি পত্রিকা সম্বন্ধে যাঁর চিন্তা ভাবনা দায়িত্ব মনোযোগ সকলের অপেক্ষা বেশি তাঁর?

অন্য একটি পত্রে[৫] কবি হঠাৎ সাধনার উল্লেখ করেছেন। সেখানেও তিনি সাধনাকে 'আমার সাধনা' বলেছেন। কবির উক্তি, "আমার সাধনার নিত্য নৈমিত্তিক লেখা সেরে চা খাবার জন্যে উপরে যাচ্ছি, এমন সময়ে প্রচণ্ড ঝড় এসে উপস্থিত।"

সাধনার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে নতুন পত্রিকার জন্য লেখা চেয়ে চিঠি দেন। ইতিপূর্বে শ্রীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বালক পত্রিকাতেও সম্পাদকের চাপে কিছু কিছু লিখেছিলেন। আমরা দেখেছি হিতবাদীর জন্যও রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রের কাছ থেকে লেখা চেয়েছেন। এবার সাধনা পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দাবি পত্র গিয়ে পৌঁছল শ্রীশচন্দ্রের হাতে। কবি বলছেন, "সাধনার প্রথম সংখ্যা কি তোমার হস্তগত হয়েছে? ··· তুমি কি রাজকার্যে এমনি মগ্ন হয়ে গেছ যে রাজদণ্ড ছেড়ে লেখনী ধরবার অবসর নেই? একটু আধটু লিখো। সাধনায় কেবলই ঠাকুরের নাম ভালো দেখতে হয় না। কিন্তু আজকাল তোমাকে লেখাতে অনেক সাধনা চাই, এবং সে সাধনাও সিদ্ধ হয় কি না সন্দেহ।"[৬]

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে সাধনার প্রথম সংখ্যার লেখকসূচিতে পর পর যাঁরা ছিলেন: দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রবন্ধ), ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর (কবিতা), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গল্প), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রবন্ধ), সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রবন্ধ), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রবন্ধ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিভাগীয় রচনা), সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গল্প), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রবন্ধ), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রচনা), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিভাগীয় রচনা), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্রবন্ধ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ধারাবাহিক রচনা), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিভাগীয় রচনা)।

দেখা যাচ্ছে বিভাগীয় রচনা তিনটি। এক : সাময়িক সারসংগ্রহ, দুই : বৈজ্ঞানিক সংবাদ এবং তিন : সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা। এই তিনটি বিভাগের একমাত্র লেখক যে শুধু

---

৪. ছিন্নপত্রাবলী, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩।

৫. ছিন্নপত্রাবলী, ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

৬. বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৯।

রবীন্দ্রনাথ তা নয়, এই বিভাগ তিনটিতে এক-একটি সংখ্যায় কবির রচনার পরিমাণও বিপুল। প্রথম সংখ্যায় সাময়িক সারসংগ্রহে পাঁচটি রচনা, বৈজ্ঞানিক সংবাদে চারটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ এবং সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা বিভাগে আছে তিনট সাহিত্যপত্রিকার দীর্ঘ সমালোচনা।

সাধনার প্রথম প্রকাশ পর্বে রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রকে যে চিঠি[৭] দেন তা থেকে সাধনার উদ্দেশ্যের কথা কিছু জানা যায়। কবি লিখছেন, "একটা কাগজের ভারি দরকার হয়েছে। অনেকগুলো কথা বলা আবশ্যক, অথচ বড় বড় লোক সবাই নীরব এবং তাঁদের মধ্যেও দুই একজন নতুন নতুন বুলি বের করছেন। একে ত বাঙালীর বুদ্ধি খুব যে পরিষ্কার তা নয়, তার পরে সম্প্রতি হঠাৎ একটা আধ্যাত্মিক কুয়াশা উঠে চারিদিক আচ্ছন্ন করে দিয়েছে—সাহিত্য থেকে সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্য এবং সত্য একেবারে লোপ পেয়েছে। দিনকতক খুব কঠিন কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার হয়েছে।"

পূর্বেই লক্ষ করেছি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভুরি পরিমাণে ছিল।" এ-বিষয়ে দু-একটি নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে।

বলেন্দ্রনাথের দুটি রচনার কথা বলি। রত্নাবলী ও পশুপ্রীতি। সাধনা পত্রিকায় রত্নাবলী ১২৯৮ পৌষে এবং পশুপ্রীতি ১৩০০ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১২৯৮ পৌষ অর্থে পত্রিকার প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে বলেন্দ্রনাথকে লিখছেন, "তোমার রত্নাবলী বেশ হয়েছে—একটু আধটু সংশোধন করে দিলুম।"[৮]

অন্য একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ পত্রে লিখেছেন, "পশুপ্রীতি ব'লে ব [লু] একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছে, আজ সমস্ত সকাল বেলায় সেইটে নিয়ে পড়েছিলুম।···আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু আমিয়েল পশুদের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছে— [বলুর] লেখায় আমি সেইটে সমস্তটা নোট বসিয়ে দিয়েছি। সব সুদ্ধ [বলুর] এ লেখাটা আমার তেমন ভালো লাগেনি···ইনিয়ে-বিনিয়ে বানিয়ে-বানিয়ে লিখেছে—সহৃদয়তাপূর্ণ অত্যুক্তিশূন্য সত্যের সরলতার সুর দিচ্ছে না।···বানানো কথা অনেক স্থলে দূষণীয় নয়, কিন্তু এ রকম জিনিস ঠিক খাঁটি না হলে মনটা ভারী বিমুখ ও বিরক্ত হয়ে ওঠে। কাদম্বরীর সেই মৃগয়াবর্ণনা থেকে অনেকটা আমি তর্জমা করতে বলে দিয়েছি। পাখিরাও যে কতটা আমাদেরই মত— একটা জায়গা আছে যেখানে তাতে আমাতে প্রভেদ নেই— পাখির সন্তানবাৎসল্য প্রাণের মমতা ঠিক আমাদেরই মত— এইটে বাণভট্ট আপন করুণ কল্পনাশক্তির দ্বারা অনুভব ও প্রকাশ করেছেন— সেই touch of nature makes the whole world kin!"[৯]

রবীন্দ্রনাথই যে সাধনা পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বলেন্দ্রনাথকে লেখা কবির কোনো কোনো চিঠিতে। সাধনার সূচনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ এ-কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। অগ্রহায়ণে প্রথম সংখ্যা বেরল। প্রথম সংখ্যার কথা শ্রীশচন্দ্রকে লেখা কবির চিঠিতে দেখেছি। পৌষ সংখ্যা কীভাবে ছাপা হবে না-হবে, কী কী লেখা যাবে, হেডিং সাবহেডিং কেমন হবে, গল্পের নামকরণ কী হবে ইত্যাদি প্রসঙ্গের কথা বলেন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে পাই।[১০]

---

৭. বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৯।

৮. বিশ্বভারতী পত্রিকা চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩।

৯. ছিন্নপত্রাবলী, ২২ মার্চ ১৮৯৪।

১০. বিশ্বভারতী পত্রিকা চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩।

হাতে আছে ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আটটি কবিতা। তার মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে ভালো, কোন্‌টি বা পৌষ মাসে যাবে? কবি লিখছেন, "ঋতির 'অভিমান' কবিতাটি আমি ভালো বুঝতে পারলুম না—সপ্তস্বর কবিতাটি সবচেয়ে ভালো হয়েছে। এইটে পৌষ মাসে দিলে ভালো হয়। সন্ধ্যার পথিকটিও ভালো। তারপরে order of merit অনুসারে লিখতে গেলে রামমোহন রায়, চিত্রদর্শন, যৌবন, ব্যাকুলতা, মালাগাঁথি, অভিমান। অভিমানটা সব শেষে পড়ে। শেষ দুটি ছাড়া অন্যগুলি বেশ ভালো হয়েছে। আমার য়ুরোপের ডায়ারি পাঠালুম। এই লেখাগুলোর হেডিংয়ের নীচে ব্র্যাকেটের মধ্যে ('য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি') সাবহেডিং বসিয়ে দিয়ো। 'যক্ষি' নাম দেওয়াটা সঙ্গত হয় না তাহলে পাঠক শেষ পর্যন্ত পড়বার পূর্বেই গল্পটা কতক বুঝতে পারবে। বরং 'বিষয় দান' কিংবা 'সম্পত্তি সমর্পণ' নাম দেওয়া ভালো। সেই গল্পটাই পৌষ সংখ্যায় দিয়ো।—এবারকার গল্পটা বড় মস্ত হয়েছে—তার নাম' 'স্বর্ণমৃগ' কিংবা 'মরীচিকা' দেওয়া যেতে পারে। পৌষ মাসের সাময়িক সাহিত্যের জন্যে বাঙলা কাগজ পাঠিয়ো।

যদি সাধনা ছাপার ব্যাঘাত না হয় এবং তোমার সুবিধে হয় তা হলে বোটে আমাদের এখানে এলে আমি তোমাকে দিয়ে কতকগুলো লেখাতে পারি।···

আমার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, কার্তিক মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকার সমালোচনা, প্রাচ্য সমাজ, পৌষ মাসের জন্য সাময়িক সারসংগ্রহ— এ সবগুলো পাওনি?"[১১]

রবীন্দ্রনাথ যখন এ-চিঠি লেখেন তখনও সাধনার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। চিঠিতে তারিখ নেই। এই পত্রটিতে মুখ্যত পৌষ মাসের সাধনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে কবি যে বলেছেন "কার্তিক মাসের 'সাহিত্য' পত্রিকার সমালোচনা...পাওনি?" — এর থেকে বোঝা যায় সাধনার প্রথম সংখ্যা তখনও বেরোয়নি। কারণ অগ্রহায়ণ সংখ্যাতেই আছে সাহিত্যের উক্ত সংখ্যার কবিকৃত সমালোচনা। তা ছাড়া কবির নির্দেশ মতো অগ্রহায়ণ সংখ্যাতেই দেখা যাচ্ছে— য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি রচনাটির হেডিংয়ের ('যাত্রা আরম্ভ') নিচে ব্রাকেটের মধ্যে সাবহেডিংয়ে য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি বসানো হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের চিঠির নির্দেশাদির সঙ্গে পৌষ সংখ্যাটি দেখা যেতে পারে। ঋতেন্দ্রনাথের কবিতা সপ্তস্বর পৌষ সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছে। এই সংখ্যায় কবির সম্পত্তি সমর্পণও ছাপা হল। তা ছাড়া পৌষ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, প্রাচ্য সমাজ, সাময়িক সারসংগ্রহ। কবি পত্রে লিখেছিলেন, "পৌষ মাসের সাময়িক সাহিত্যের জন্যে বাঙলা কাগজ পাঠিয়ো।" পৌষ সংখ্যায় সাময়িক সহিত্য সমালোচনা বিভাগে ছাপা হয়— নব্যভারত ও সাহিত্য— এই দুটি পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যার কবিকৃত সমালোচনা।

বলেন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের আর-একটি পত্র[১২] বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চিঠিতে তারিখ নেই। তবে বিষয় দেখে বোঝা যায় ১২৯৯ শ্রাবণের পূর্বে রচিত। এ চিঠি থেকেও স্পষ্টত বোঝা যায় সাধনা পত্রিকা প্রত্যক্ষভাবে সম্পাদনা করতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অপরদিকে পত্রিকা সম্পাদনার কাজে 'সম্পাদক' সুধীন্দ্রনাথের যে কিছুমাত্র ভূমিকা ছিল— এমন সন্ধান আমরা পাচ্ছি না।

১১-১২ বিশ্বভারতী পত্রিকা চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩।

নিচে বলেন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি উদ্ধৃত করি :

ওঁ

বলু—

তোমাকে আজকের রেজেস্ট্রি ডাকে যে যে লেখা পাঠান যাচ্ছে আগে তার একটা নম্বরওয়ারি ফর্দ দিই পরে তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য লিখব।—

১। কাবুলিওয়ালা। (গল্প)

২। সমস্যা-পূরণ (ঐ)

৩। সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা।—

৪। জাহাজের কাহিনী। (ডায়ারি)-

৫। সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ। (লোকেনের পত্র)—

৬। মানব প্রকাশ।— (তদুত্তর)।

৭। স্বরবর্ণ 'এ'।

৮। দুর্বোধ বৈষ্ণব পদাবলী।

৯। গোবিন্দ দাস।

১০। পহুঁ সম্বন্ধে ক্ষীরোদবাবুর পত্র।—

প্রথম কথা হচ্ছে—এবারে ১৩ আশ্বিন পূজার দিন, অতএব ভাদ্র আশ্বিন মাসের কাগজ একসঙ্গে বের করা উচিত। দুটো কাগজ আলাদা না করে একসঙ্গে করবার গোটাকতক সুবিধা আছে— প্রথমতঃ মলাট এবং দপ্তরী খরচ কম পড়ে, দ্বিতীয়তঃ অনেক লেখা একত্র থাকাতে বেশ বৈচিত্র্য পাওয়া যায়, তৃতীয়তঃ বড় কাগজখানা হাতে এলে লাগে ভাল, চতুর্থতঃ বড় বড় লেখাগুলো একেবারে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়— অতএব এই বেলা থেকে তৎপ্রতি মন দিয়ো।—

প্রথম দুটো গল্প তোমার কাছে রেখে দিয়ো ওদুটো আপাততঃ ব্যবহারের জন্য নয়।

নম্বর তিন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে নব্যভারত এ পর্যন্ত না পাওয়াতে কেবল দুই সংখ্যা সাহিত্যের সমালোচনাই পাঠিয়ে দিলুম।

নম্বর চার লেখাটা ভাদ্র আশ্বিন একেবারে দু-মাসের মত।

নম্বর ৫, পেন্সিলে লেখা, কিঞ্চিৎ অপরিষ্কার, একটু সাবধানে ছাপতে হবে। আর কপি করতে পারিনে।—

নম্বর ছয়— ভাদ্রমাসের। ওটা এইবেলা ছাপিয়ে একটা প্রুফ লোকেনের কাছে পাঠাতে হবে, সে সেইটে দেখে তার শেষ উত্তর লিখলে তবে সেইটে আবার ঐ ভাদ্র আশ্বিনের কাগজে ছাপা হবে।—

নম্বর ৭— শ্রাবণে দেবে কি ভাদ্রে দেবে সুবিধে বুঝে তোমরা স্থির কোরো।—

নম্বর ৮, ভাদ্রমাসে দিলেই হবে।—

নম্বর ৯। অঘোরকে অবিলম্বে পত্র লিখো তার সমস্ত প্রবন্ধটা শেষ করে পাঠাতে। তা হলে ভাদ্র আশ্বিনের সংখ্যায় একেবারেই বের করতে পারবে।

নম্বর দশ। এই লেখাটা ক্ষীরোদবাবু সাহিত্যে পাঠিয়েছিলেন— সাহিত্যে সম্পাদক, এটা